দিল্লির দিনলিপি

মূল
সাইয়েদ আবদুল হাই হাসানী নদবী রহ.

অনুবাদ
আবদুল্লাহ আল মুনীর

নাশাত

দিল্লির দিনলিপি
মূল : সাইয়েদ আবদুল হাই হাসানী নদবী রহ.
ভূমিকা : সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.
অনুবাদ : আবদুল্লাহ আল মুনীর

প্রকাশকাল : জুলাই ২০২৩

প্রকাশক
আহসান ইলিয়াস
নাশাত পাবলিকেশন
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
০১৭১২২৯৮৯৪১, ০১৮৪১৫৬৪৬৭১
nashatpub@gmail.com

অনুবাদস্বত্ব : নাশাত

প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
বানানসংশোধন : মুহাম্মদ ইবরাহিম

মূল্য : ২৪০ (দুইশ চল্লিশ) টাকা মাত্র

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

ISBN : 978-984-97764-3-7

আমাদের কজন তরুণকে উন্মাদ করে তুললো একটি বই।
সাহিত্যের পথে পাগলের মতো শুরু হলো আমাদের যাত্রা।
আসর, রোজনামচা, প্রবন্ধপাঠ— বুঁদ হয়ে রইলাম এসবে।

‘সাহিত্যের ক্লাস’ আমাকে যে পথ দেখিয়েছে, সে পথে আজও হাঁটছি। কবিতা হবার আকাঙ্ক্ষায় হয়তো আমৃত্যু হেঁটে চলবো।

সাহিত্যের ক্লাসের মহান গুরু— মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন
আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে বেঁচে থাকুন।

দায়মুক্তি

হাকিম সাইয়েদ আবদুল হাই হাসানী রহ. রচিত *দেহলি আওর উসকে আতরাফ* মূলত উনিশ শতকের ভারতীয় সুফি ও ইলমি-ধারার জীবন্ত এক ক্যানভাস। শুধু তাই নয়- ঐতিহাসিক দুর্লভ সব তথ্যে পূর্ণ এক আকরগ্রন্থ। বহু লেখকের গ্রন্থপঞ্জিতে উল্লেখ হয়েছে এই মূল্যবান দিনলিপির নাম। *দেহলি আওর উসকে আতরাফ* বারকয়েক পাঠের পর আমার ভেতর এক ঘোরলাগা তৈরি হয়। মুগ্ধ হই অজানা সব তথ্য, গল্প, স্থান-পরিচিতি এবং লেখকের মিষ্টি গদ্যে। এরপর শুরু করি অনুবাদ। আজ থেকে একশ আটাশ বছর আগের উর্দুগদ্য, সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আরবি ফারসি প্রবাদ-পঙক্তির আধিক্য আমার অনুবাদের গতি বারবার মন্থর করেছে। তবু আল্লাহর তাওফিকে মাসদুয়েকের পরিশ্রমে বইটির অনুবাদ শেষ করি।

আমার হাতে যে নোসখাটি ছিল, তা দিল্লি উর্দু একাডেমি থেকে ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা টেনেছিলেন উর্দুসাহিত্যিক ও জামিয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়ার উর্দুবিভাগের অধ্যক্ষ ড. সাদেকা যাকী। অনুবাদ প্রায় শেষের দিকে; এমন সময় খুঁজে পাই বইটির প্রথম প্রকাশিত নোসখা। এই নোসখাটি ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে মাওলানা আবুল হাসান আলী নদবী রহিমাহুল্লাহ নিজ উদ্যোগে প্রকাশ করেছিলেন। নোসখাটি পেয়ে আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার আনন্দ অনুভব করি। কারণ এতে ছিল আলী মিয়া নদবী রহিমাহুল্লাহর লেখা ভূমিকা এবং সাইয়েদ সুলাইমান নদবী রহিমাহুল্লাহর অভিমত। এ ছাড়াও এতে বহু মূল্যবান টীকা-টিপ্পনি যুক্ত ছিল, যার সাহায্যে অনেক অস্পষ্ট অধ্যায়ের সমাধানে পৌঁছা সহজ হয়।

বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করে আমরা সাদেকা যাকীর ভূমিকাটি ভিন্ন শিরোনামে অনুবাদ করে দিই। আলী মিয়া নদবীর ভূমিকাটি গ্রন্থের শুরুতে এবং সাইয়েদ সুলাইমান নদবীর অভিমতটি ফ্ল্যাপে উল্লেখ করা হয়।

দেহলি আওর উসকে আতরাফ বইয়ের লেখকপ্রদত্ত নাম *আরমোগানে আহবাব*। বাদামি রঙের খাতা থেকে এটি সর্বপ্রথম *মাআরিফে* প্রকাশ করেছিলেন সাইয়েদ সুলাইমান নদবী। কয়েক কিস্তিতে প্রকাশিত সেই দিনলিপি সর্বপ্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন লেখকের মনীষী-পুত্র মাওলানা আবুল হাসান আলী নদবী। কয়েক যুগ পর সে বইয়ের কপিগুলো বিলুপ্তির আশংকা দেখা দিলে দিল্লি উর্দু একাডেমি বইটির পুনঃপ্রকাশ করে। এই ধারাবাহিকতায় বইটিতে যুক্ত হয় বেশ কিছু টীকা। আমরা সবক'টি টীকা বহাল রেখেছি। (আ) চিহ্নযুক্ত টীকাগুলো আবুল হাসান আলী নদবীর এবং (সু) চিহ্নযুক্ত টীকাগুলো সাইয়েদ সুলাইমান নদবীর। ক্ষেত্রবিশেষ কিছু টীকা আমি যুক্ত করেছি।

অনুবাদ করতে যেয়ে ভাষার গতি যথাসাধ্য সহজ, সাবলীল ও প্রাঞ্জল করার চেষ্টা করেছি। বেশকিছু অজানা স্থান ও ব্যক্তির পরিচিতি যুক্ত করেছি। বইটি আদতে অতটা সহজও নয়- তবু চেষ্টা করেছি পারিভাষিক জটিলতা এড়িয়ে পাঠকের উপযোগী বোধগম্য বাক্য ও ভাষা ব্যবহারের। বইয়ের অধিকাংশ স্থানে মূলানুগ অনুবাদের সাথে মিশ্রণ ঘটেছে নিজস্ব কিছু বাকরীতি ও অলংকারের। দুর্বোধ্য কিছু স্থানে ভাবানুবাদের আশ্রয় নিয়েছি। এক্ষেত্রে আমি কতটুকু সফল হয়েছি আল্লাহই ভালো জানেন। আমরা আশাবাদী- পাঠক বইটি পড়ে তৃপ্তি লাভ করবেন। একজন পাঠক হিসেবে আমারও প্রিয় হয়ে উঠেছে অনুবাদটি। এ ছাড়া বইয়ের মূল্যায়নমূলক কিছু লিখছি না। দুজন মনীষী বই নিয়ে যতটুকু বলেছেন, তা যথেষ্ট ও যথার্থ। অক্লান্ত পরিশ্রমের পরও আমাদের ভুলত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়।

বইটি প্রকাশের আগে নানাভাবে যাদের সহায়তা পেয়েছি, তাদের নাম এ মুহূর্তে স্মরণ করতে চাই। শুরুতেই কৃতজ্ঞতা জানাই নাশাতের কর্ণাধার শ্রদ্ধেয় আহসান ইলিয়াস ভাইয়ের প্রতি, এই কালজয়ী গ্রন্থটির সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য। কথাসাহিত্যিক আলমগীর মুরতাজা, মাওলানা যুবাইর আরশাদ, মাওলানা ওয়াহিদুর রহমান, মুফতি আবু বকর সিরাজী, আলমগীর হোসেন মানিক, মাওলানা ইসহাক আবুল কাসেমসহ অনেকেই আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন।

আবদুল্লাহ আল মুনীর
বাংলাবাজার, ঢাকা
৩১-৮-২২

মুকাদ্দিমা

সাধারণত প্রচলিত ইতিহাস-গ্রন্থসমূহে অতীতের কোনো কাল বা সভ্যতার প্রকৃত চিত্র দেখতে পাওয়া যায় না। ইতিহাসের সম্পর্ক (বিশেষত প্রাচ্যদেশে) রাজা-বাদশাহ, রাজদরবার, যুদ্ধ-বিগ্রহ বা কেন্দ্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির সাথে হয়ে থাকে। তাতে সাধারণ জীবনযাপনের দৃশ্য অবলোকন করা যায় না। ইতিহাস থেকে সংশ্লিষ্ট কালের প্রকৃতি ও রসবোধ, প্রবণতা, বিচিত্র মনঃসংযোগ, আলাপচারিতার বিষয়-আশয় ও স্বভাবজাত আগ্রহ বোঝা মুশকিল। জীবনের প্রকৃত ও অকপট দৃশ্য দেখতে আমাদের দ্বারস্থ হতে হয় সফরনামা, রোজনামচা ও বন্ধুদের কাছে প্রেরিত পত্রাবলির স্পষ্ট ভাষ্যের; যদি তা কৃত্রিমতা ও লৌকিকতামুক্ত হয়।

তখন আমি তরুণ বয়সের এক শিক্ষার্থী। একদিন আমার বাবা হাকিম সাইয়েদ আবদুল হাই সাহেবের লিখিত খাতাপত্র হাতড়িয়ে *আরমোগানে আহবাব* শিরোনামধারী বাদামি কাগজের একটি পাণ্ডুলিপি খুঁজে বের করলাম। এই পাণ্ডুলিপিতে তার দিল্লি ও তৎসংলগ্ন এলাকাগুলোর ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখা ছিল। এই ভ্রমণ তিনি করেছিলেন ১৩১২ হিজরি মোতাবেক ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে। সফরনামা হোক বা দিনলিপি; পাণ্ডুলিপিটির ভাষা এতটা হৃদয়গ্রাহী ও সুমিষ্ট ছিল, যার পুরোটা না পড়ে হাত থেকে রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। সেদিনের পর থেকে কতবার যে বইটি পড়েছি তার হিসেব নেই। প্রতিবারই পেতাম ভিন্ন স্বাদ, ভিন্ন রস। আমার জীবনে যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়েছি, এটি তার একটি। এই দিনলিপি থেকেই সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহিমাহুল্লাহর প্রতি আমার আত্মিক ভক্তি ও বিশ্বাসের সূত্রপাত ঘটে। আমার ভেতর সমকালীন আল্লাহওয়ালা ও বুজুর্গদের সাথে সাক্ষাতের স্পৃহাও তৈরি করে দেয় এই বইটি।

১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের কথা। তখন আমি *সিরাতে সাইয়েদ আহমদ শহীদের* পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করছি। কুদরতিভাবেই এই দিনলিপি থেকে তথ্যগ্রহণের কথা হৃদয়ে আবর্তিত হল। সৌভাগ্যক্রমে সেই দিনগুলোতে একবার সাইয়েদ সুলাইমান নদবী সাহেব আমার বাড়িতে এলেন। সিরাতে সাইয়েদ আহমদ শহীদের পাণ্ডুলিপি নেড়েচেড়ে দেখার সময় উৎসগ্রন্থের তালিকায় তিনি এই দিনলিপির নাম দেখলেন। তখনোই তিনি বইটি পড়ার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। আমি তাকে বইটি পড়তে দিলাম। পড়াশেষে তিনি তাগাদা দিয়ে বললেন, 'এর অনুলিপি করে দারুল মুসান্নিফিনে পাঠিয়ে দিন। *মাআরিফে* প্রকাশ করব।' অনুলিপি প্রস্তুত করে পাঠিয়ে দিলাম। তিনি এর শুরুতে পরিচিতিমূলক কিছু কথা যোগ করে *মাআরিফে* কয়েক কিস্তিতে প্রকাশ শুরু করলেন। দিনলিপিতে

নিজেই যুক্ত করলেন শিরোনাম, অস্পষ্ট স্থানে টানলেন ব্যাখ্যামূলক নোট ও টীকা।[১] ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে জুন পর্যন্ত *মাআরিফে* দিনলিপিটি প্রকাশিত হল।

মাআরিফে প্রকাশের পর এটি অনেক খ্যাতনামা লেখক ও পাঠকসমাজে ব্যাপক প্রশংসা কুড়ালো। নানাভাবে আমার কাছে তারা ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে থাকে। বিশেষ কিছু দীনি ও ইলমি মজলিসে আমি বইটির নানা অংশ পাঠ করতাম; ওখান থেকেও বড়রা তাগিদ দিতেন বইটি প্রকাশের। কিন্তু বিভিন্ন কারণে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

মরহুম আব্বাজানের সেই ঐতিহাসিক সফরের দীর্ঘ ৬৫ বছর (ইংরেজি হিসেবে ৬৩ বছর) পর তার দিনলিপিটি প্রকাশ হচ্ছে। বলতে গেলে অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে গেছে; কিন্তু কালের পরিবর্তন শত বছরেও হয় না, আবার হলে এক মুহূর্তেই পৃথিবীর রূপ বদলে যেতে পারে। এই ৬৫ বছরে হিন্দুস্থানের রূপ এতটাই বদলে গেছে, যতটা বদলাতে এক শতাব্দী লেগে যাওয়ার কথা। পূর্বের তুলনায় মানুষের চরিত্র, সুখ-দুঃখ, আগ্রহ-উদ্দীপনা, বৈঠক-সমাবেশের বিষয়আশয়, পর্যটকদের তত্ত্বতালাশ, শিল্পের ধরন ও তা অর্জনের উপায়গুলো একেবারে বদলে গেছে। দিনবদলের এই হাওয়া কেবল রাষ্ট্রে নয়; এমন নতুন এক বিশ্ব ও যুগ আবর্তিত হয়েছে, পুরোনো বিশ্বের সাথে জাতিগত ধারাবাহিকতা ছাড়া যার কোনো সম্পর্ক নেই। বক্ষ্যমাণ দিনলিপি হারিয়ে যাওয়া সেই সময়ের প্রতিচ্ছবি, সরল ও সত্য প্রতিচ্ছবি, যা অতিরঞ্জন ও অতিশয়োক্তি থেকে মুক্ত। এমন নিরঙ্কুশ চিত্র কেবল এ ধরনের দিনলিপিতেই আঁকা সম্ভব। তবে হতাশার বিষয় হল, আমাদের জ্ঞান ও সাহিত্যের ভান্ডারে এমন সাহিত্যকর্মের স্বল্পতা ব্যাপক।

পাঠকের জন্য আরও কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয় :

১. একজন পর্যটক মাত্রই নিজ স্বভাবজাত আগ্রহ, শিক্ষা-দীক্ষা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে থাকে। ভ্রমণকালে সবকিছুই তার দৃষ্টিগোচর হয়, তবে বিশেষ আগ্রহের স্থানেই কেবল দৃষ্টি থমকে দাঁড়ায়। নিজ ভ্রমণকাহিনি বা দিনলিপিতেও আগ্রহের বিষয়টিই সুস্পষ্টভাবে তারা ফুটিয়ে তুলতে চান। এটি মানুষের স্বভাবজাত ব্যাপার; দোষ তো নয়ই; বরং গুণই বলা যায়। আমার বাবা এমন ইলমি ও দীনি পরিবেশে বেড়ে উঠেছিলেন, যার প্রভাবে তার ভেতর খোদাপ্রেম ও তাসাউফের প্রবণতা তৈরি হয়েছিল। পাশাপাশি জ্ঞানার্জনের প্রতি অদম্য আগ্রহ ও হাদিসশাস্ত্রে বিশেষ সম্পর্কও ছিল তার। এজন্য তিনি যেখানেই যেতেন, খুঁজে বেড়াতেন বুজুর্গ-মাশায়েখ, আলেম ও অভিজ্ঞ দীনি ব্যক্তিদের। এই ভ্রমণকাহিনি পড়তে গিয়ে পাতায় পাতায় পাঠক এ ব্যাপারগুলো অনুভব করবেন।

[১] সাইয়েদ সুলাইমান নদবীর টীকাগুলো বক্ষ্যমাণ অনুবাদেও রাখা হয়েছে। অতিরিক্ত কিছু টীকা যুক্ত করেছেন সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী। নতুনভাবে আরও কিছু টীকা যুক্ত করেছেন অনুবাদক।

কিন্তু এসবের সাথে সাধারণ জীবনযাপন ও পরিবর্তিত সময়কেও তিনি সচেতনভাবে পাঠ করেছেন। প্রাচীন নিদর্শন ও ঐতিহাসিক স্থানগুলো তিনি ভ্রমণ করেছেন। পুরোনো ইমারত ও ভগ্নাবশেষ দেখেছেন গভীর দৃষ্টিতে। তুলে এনেছেন সংশ্লিষ্ট স্থানের ইতিহাস ও দুর্লভ সব তথ্য। এতে বোঝা যায়- তার ইতিহাসপাঠ ছিল বহু বিস্তৃত। বইয়ে সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকরণ ব্যবহার করে রচনার ভিত করে তুলেছেন সুদৃঢ়। এই বইয়ে এতটা তেজী ও প্রভাবময় অধ্যায়ও দেখেছি- যা তাকে তরুণ আলেম থেকে প্রবীণ অভিজ্ঞ সাহিত্যিকদের দলভুক্ত করে দেয়।

২. এই দিনলিপি থেকে বিগত শতাব্দীর আলেমদের জ্ঞান ও সভ্যতার ব্যাপ্তি বোঝা যায়। বোঝা যায় কতটা বহুমুখী বৈচিত্র্যময় ছিল তাদের সংস্কৃতি ও রীতিনীতি। পাঠক এই বইয়ে পাবে, গদ্য ও পদ্যের সুষ্ঠু সম্মিলন, ইতিহাসের অজানা অধ্যায়, ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের শ্রেণিবিন্যাস, তাসাউফের সিলসিলা ও তার শাখা-প্রকারভেদ, প্রাচীন বুজুর্গদের রচনাবলি ও দুর্লভ কিতাবাদি সম্পর্কিত তথ্য এবং সচেতনভাবে নিজের মাতৃভূমি ও সময়কাল দেখার বিবরণ। প্রয়োজনীয় কোনো বিষয় তিনি এড়িয়ে গেছেন বা ভাসা-ভাসা ধারণা দিয়েছেন, এমনটা হয়নি। তিনি বহুমাত্রিক পাণ্ডিত্যের অধিকারী ও ইলমের এক চারণভূমিতে বিচরণ করে বেড়ে উঠেছেন, তার রচনাশৈলী এ কথার প্রমাণ বহন করে। এতে সন্দেহ নেই, সে যুগে তিনি কেবল এক তরুণ আলেম মাওলানা আবদুল হাই ছিলেন না; তার মস্তিষ্কে ছিল খোদাপ্রদত্ত এক শক্তি। পরিবেশ ও বংশীয় প্রভাব তাকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়েছিল। তবে এই বিচিত্র সভ্যতা ছিল সে যুগের বৈশিষ্ট্য, যুগের সাথেই তার বিলুপ্তি ঘটেছে। এই শতকে এসে এমন উপমা খুঁজে পাওয়া স্বপ্নাতীত। সব প্রদীপ নিভে গেছে; অবশিষ্ট প্রদীপগুলোও সকালের তারকার মতো অস্তগামী।

৩. বক্ষ্যমাণ ভ্রমণকাহিনি পড়ে বোঝা দায়- লেখক মাত্র ছাব্বিশ বছরের এক টগবগে যুবক ছিলেন। তারুণ্যের উন্মাদনা ও অস্থিরতার চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। এই অটলতা ও পরিপক্কতার উন্মেষ তাকে শেষজীবনে সময়ের বৃহৎ গ্রন্থের লেখক ও বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের (নদওয়াতুল ওলামা) কর্ণধার বানিয়ে তুলেছিল।

بالائے سرش زہوشمندی#می تافت ستارہ بلندی[১]

এই বইয়ের পাতায় পাতায় লেখকের দীনি আত্মসম্মানবোধ, সহানুভূতিশীলতা ও প্রভাবিত হৃদয়ের দেখা মিলে। দিল্লির আনাচেকানাচে মুসলিমদের উত্থান-পতন ও সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যমাখা সময়ের ইতিহাস খুঁজতে দেখা যায়। তিনি হারিয়ে যাওয়া স্মৃতিচিহ্ন ও মাটিতে মিশে যাওয়া ঐশ্বর্যের ভগ্নাংশের দিকে তাকিয়ে আঁখিজল ফেলেছেন, আর কম্পিত কলমে লিখেছেন তার বিবরণ। লালকেল্লার বিবরণ পড়ুন বা পুরোনো দিল্লির, কুতুব মিনারের উপাখ্যান পড়ুন কিংবা পড়ুন দিল্লি ও

[১] মর্মার্থ- বুদ্ধিমত্তার দরুন তার মাথার উপর সৌভাগ্যের তারকা চমকাচ্ছিল।

তার উত্থানপর্বের স্মৃতিচারণ করে লেখা মর্সিয়া—পাতায় পাতায় তার কলম আলিঙ্গন করেছে কলব। এই দীনি অনুভূতিই তাকে সাহস ও শক্তি যুগিয়েছে *ইয়াদে আইয়াম* ও *জান্নাতুল মাশরিকে*র মতো গ্রন্থ রচনার প্রতি, যা মুসলিমদের গৌরবোজ্জ্বল ক্যানভাসরূপে সমাদৃত হয়েছে সর্বমহলে। এরপর *নুজহাতুল খাওয়াতিরে*র মতো আট খণ্ডের সুবিশাল গ্রন্থ রচনা করেছেন, যাতে সন্নিবেশিত হয়েছে হিন্দুস্থানের পাঁচ হাজার বুজুর্গের জীবনী।[১]

৪. এই সংক্ষিপ্ত সফরনামা ও রোজনামচা ইতিহাস ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব রাখে। যখন ন্যায়নিষ্ঠ গবেষণায় এদেশের জ্ঞান ও সংস্কৃতির ইতিহাস সংকলিত হবে তখন এই ছোট্ট দিনলিপি তার সহায়ক হয়ে উঠবে। এর থেকে বেরিয়ে আসবে মূল্যবান কিছু তথ্য ও সঙ্কেত।

আমি আশা করছি দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের পাঠক এই বইটি প্রফুল্লচিত্তে গ্রহণ করে নেবেন। বংশীয় আমানত (এখন পর্যন্ত যা আমি সংরক্ষণ করে রেখেছি) পুরো জাতির আমানত হয়ে উঠবে; ছড়িয়ে যাবে দূরদূরান্তের পাঠাগারে। আল্লাহই উত্তম সংরক্ষণকারী।

আবুল হাসান আলী নদবী
দায়েরায়ে শাহ আলামুল্লাহ, রায়বেরেলী

[১] হিন্দুস্থানের আলেম, বাদশাহ, ওজির ও বুজুর্গদের জীবনী নিয়ে সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও সর্ববৃহৎ গ্রন্থ এটি। বইটি আরবি ভাষায় রচিত হয়েছে।

উর্দু-ভ্রমণসাহিত্য ও দিল্লির দিনলিপি

দিল্লির দিনলিপি গ্রন্থটি হাকিম সাইয়েদ আবদুল হাই হাসানীর দিল্লিভ্রমণের দিনলিপি। দিল্লি ও তৎসংলগ্ন এলাকাগুলোতে ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে এই ভ্রমণ সম্পন্ন করেন তিনি। সাইয়েদ সুলাইমান নদবী বেশ কিছু টীকা যুক্ত করে মাসিক মাআরিফের (১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি থেকে জুন) কয়েক সংখ্যায় ডায়েরিটি প্রকাশ করেন। সেকালের শিক্ষিতসমাজে এটি খুব দ্রুতই জনপ্রিয়তা পায়। এর পাঠকপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতাই পরবর্তীতে একে গ্রন্থবদ্ধ করবার চাহিদা তৈরি করেছিল। এরপর ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমবারের মতো সফরনামাটি প্রকাশ করেন লেখকের মনীষী-পুত্র মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী। এরপর অনেক বছর পেরিয়ে গেছে। একসময় বইটি দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে। জামিয়া মিল্লিয়ার লাইব্রেরিতে একটি কপি সংরক্ষিত ছিল, নেহাত পুরোনো হওয়ার ফলে যার ছিল জীর্ণদশা। মাত্র আটাশ বা ঊনত্রিশ বছরের পুরোনো একটি গ্রন্থের কেন এ হাল হল? বোঝা যায়, এই স্বল্প সময়ে বইটির পাতায় লেগেছে অসংখ্য হাতের ছোঁয়া। সময়ের তুলনায় অধিক পাঠকের গভীর দৃষ্টি নিপতিত হয়েছে এতে। ১৮৯৪ সালের এই সফরনামার মুদ্রিত কপির এমন দুরবস্থার ফলে এর প্রতি নতুন করে গুরুত্ব তৈরি হয়। আবেদন তৈরি হয় এর পুনঃপ্রকাশের। ফলে উর্দু একাডেমি দিল্লি এর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। তাদের গুরুত্বারোপের উদ্দেশ্য এজন্যও হতে পারে যে এই বইটি সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে যোগসূত্র তৈরি করেছে, যে সভ্যতা বিচিত্র আঙ্গিকে প্রভাব সৃষ্টি করেছে আপন সীমানায়। স্মৃতিবিজড়িত দিল্লিকে যারা ভালোবাসেন, সেই সংস্কৃতির মূল্যায়ন করা তাদের জন্য মোটেই কম গুরুত্বের নয়।

পাঠকের হাতে থাকা বইটির বৈশিষ্ট্য জানার আগে বিগত সময়ের বিখ্যাত সফরনামাগুলোর দিকে দৃষ্টি ফেরানো দরকার, যাদের জন্য মূলত ভ্রমণকাহিনি সাহিত্যের একটি শ্রেণিতে রূপ নিয়েছে। এদের মধ্যে মার্কো পোলো, সিন্দাবাদ, ইবনে বতুতা, কলম্বাস, ভাস্কো দা গামা, আলবেরুনির নাম উল্লেখযোগ্য। তাদের ভ্রমণকাহিনি পুরো বিশ্বে সমাদৃত হয়েছে।

সত্যিকারার্থে আজকের ভ্রমণসাহিত্য এই সাহসী পর্যটকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফল, যারা উদ্যমী হয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, যারা পরখ করে দেখতে চেয়েছেন নিজেদের সংকল্পশক্তি। এই সংকল্প আর প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিজের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে গোটা পৃথিবী হাতের মুঠোয় ভরে নেওয়ার প্রাণশক্তি। ভূগোলজ্ঞান ও নানামাত্রিক দুর্লভ অভিজ্ঞতা লাভের আনন্দ এইসব ভ্রমণের আসল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। পরবর্তীতে পর্যটকরা যখন নিজেদের অভিজ্ঞতা কাগজে লিখেছে তখন তা নানান উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত হয়েছে। উনিশ ও বিশশতকে

ভ্রমণকে শিক্ষার প্রয়োজনে গ্রহণ করা এবং তা অনায়াসগম্য হওয়ার পর ভ্রমণসাহিত্যে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে।

প্রাচীন ভ্রমণকাহিনির পর আধুনিককালে এসে এর ব্যাপ্তি কিছুটা বিস্তৃত হয়। বিশ্বভ্রমণ ছাড়াও নানামাত্রিক সৃজনশীলতা তৈরির লক্ষ্যে কিংবা এলাকাভিত্তিক বিশেষত্বের খোঁজে ভ্রমণেচ্ছা বাড়তে থাকে। এর উপাখ্যানগুলো সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যের মুখপত্র হিসেবে দৃষ্টি কাড়তে থাকে পাঠকের। বিভিন্ন ভাষায় এ ধরনের ভ্রমণবৃত্তান্ত রচিত হয়ে সমৃদ্ধ করতে থাকে বিশ্বসাহিত্য। মিসর ব্যবিলন চিন গ্রিস রোম ও আরবের ইতিহাসের অনেকাংশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে বিভিন্ন সফরনামায়।

ধারণা করা হয়, পর্যটকের লিখিত দিনলিপি থেকেই ভ্রমণকাহিনির বিবর্তন ঘটে, যা ধীরে ধীরে পেয়েছে নিয়মতান্ত্রিকতা। মানুষ সময়ের সাথে সাথে ভ্রমণকাহিনির মাধ্যমে নিজেদের অভিজ্ঞতা জানাতে অভ্যস্ত হয়েছে। হয়তো এই পালাবদলের মধ্য দিয়েই আজ আমাদের গল্পনির্মাণের স্বতন্ত্র রূপ দাঁড়িয়েছে। বাস্তব পৃথিবীর দর্শন ও পরিদর্শন এবং তাকে আয়ত্তে নেবার যে উদগ্র আগ্রহ, তা-ই হয়তো মানুষকে কাল্পনিকতার দিকে টেনে নিয়েছে। এই কাল্পনিকতার টানে মানুষ জিন-পরির চরিত্র নির্মাণ করে গল্প সাজিয়েছে। রূপকথার সেই জাদুর বিছানায় উড়ে উড়ে ভ্রমণের গল্প মনে আছে? আজ হেলিকপ্টার বা বিমানে মানুষ ঠিক তেমনি ভ্রমণ করছে। এখন সে আর রূপকথা নেই, হয়ে গেছে যাপিত জীবনের অংশ। কালক্রমে ভ্রমণের সহায়ক মাধ্যমগুলোতে বারবার পরিবর্তন এসেছে। এখন মানুষ যেমন স্থলচারী, তেমনি জলচারী। ভ্রমণের ব্যাপ্তি থেমে নেই নিম্নভূমিতে, ঊর্ধ্বাকাশেও তা সহজতর হয়েছে।

একজন সাধারণ মানুষের ভ্রমণ ও পর্যটকের ভ্রমণে রয়েছে বেশ ফারাক। সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গিয়ে যাপিত জীবনের কোনো কার্যসিদ্ধি করা। কেবল দু'চোখে দেখা ভিন্ন কোনো চাঞ্চল্য তার ভ্রমণে থাকে না। তার অভিজ্ঞতাগুলোও গ্রন্থবদ্ধ হওয়ার সুযোগ পায় না। কিন্তু একজন পর্যটকের উদ্দেশ্য নিছক চোখের দেখা নয়; বরং কোনো বিশেষ বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে জানা, এবং এর গভীরে পর্যবেক্ষণ করে নিজের অনুভূতি ও ভাবাবেগ প্রকাশ করা। এতে চিন্তা ও কল্পনার ব্যবহারও হতে পারে। প্রত্যেক পর্যটকের জন্য তার ভ্রমণোপাখ্যান লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক নয়; কিন্তু যখন একজন দূরদর্শী পর্যটকের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ হয়, তাকেই মূলত সফরনামা বা ভ্রমণকাহিনি বলা যায়।

ভ্রমণ নানা উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে। যেমন- ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, জ্ঞানতাত্ত্বিক, সাহিত্যকেন্দ্রিক ইত্যাদি। তবে ভ্রমণকাহিনির সার্থকতা হচ্ছে- এর পাঠক যখন উল্লিখিত ভ্রমণের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব যথাযথ অনুভব করতে সক্ষম হবে, যখন পাঠক জ্ঞানকেন্দ্রিক প্রশস্ততা ও অন্তর্দৃষ্টিতে গভীরতা লাভ করবে তখন অদেখা ভুবন আবিষ্কার করার তৃপ্তি উপলব্ধি করবে। সাধারণত একটি সফরনামা ভৌগোলিক জ্ঞান, ঐতিহাসিক তথ্য, সংশ্লিষ্ট সময়ের সংস্কৃতি এবং লেখকের চিন্তাভাবনা জানিয়ে থাকে।

এই মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হওয়া একটি সফরনামার জন্য আবশ্যক কিছু নয়। লেখকের ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞানগত স্বাতন্ত্র্যের খাতিরে রচনাশৈলীতে ভিন্নতা আসতে পারে। ধরুন- একটি প্রাচীন ভবন এক বিশেষ সময়ের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ধারণ করছে, নাকি শহরের সৌন্দর্য নষ্ট করছে- তা কেবল দৃষ্টিভঙ্গিই বলতে পারে। সত্যিকারার্থে একটি সফরনামায় যেমন তথ্যের পসরা থাকবে, সমান গুরুত্বের সাথে উল্লেখ হবে লেখকের প্রচেষ্টার কথা, তার হাস্যরস, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, এবং সময়ের রেখাচিত্রও। লেখকের ব্যক্তিত্ববোধের ছায়া যেমন থাকবে তেমনি থাকবে নিঃশঙ্কোচে বলার স্বাধীনতা। পত্রসাহিত্য, দিনলিপি বা স্মৃতিগদ্যের মতো ভ্রমণসাহিত্যও স্বাধীন একটি শাস্ত্র। লেখক ইচ্ছেমাফিক এর ধরন নির্মাণ করতে পারে।

উর্দুসাহিত্যে বিশশতকের আগে খুব বেশি সফরনামা রচিত হয়নি। ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ইউসুফ কম্বলপোশ[১] 'আজাইবাতে ফিরিঙ্গি' নামে সফরনামা লেখেন। বলা হয়- এটিই উর্দুভাষায় রচিত প্রথম ভ্রমণকাহিনি। এরপর ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে 'তারিখে আওধ' প্রকাশিত হয়। এর লেখক ছিলেন মৌলবী মাসিহুদ্দীন খান। আওধের নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের আস্থাভাজন ছিলেন লেখক। এরপর উল্লেখযোগ্য আরেকটি সফরনামা হচ্ছে স্যার সৈয়দের, যাতে তার শিক্ষাজীবন ছাড়াও হিন্দুস্থান ও ইউরোপের সামাজিক এবং নৈতিক অবস্থা ফুটে ওঠে। ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে নবাব হামেদ আলী খান রামপুরের সফরনামা লেখেন। তৎকালীন ইংল্যান্ডের অবস্থাও তুলে ধরেন তার সফরনামায়। ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে শিবলী নোমানী তার সফরনামা 'রোম মিসর শাম' লেখেন। এই সফরনামাগুলোতে শিক্ষাব্যবস্থা, রাজনীতি ও পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থা তুলে ধরা হয়েছিল। সেকালে কিছু বিদেশি ভাষার ভ্রমণকাহিনিও উর্দুভাষায় অনূদিত হয়।[২]

উর্দুসাহিত্যে ভ্রমণকাহিনির প্রাথমিক চিত্র আমরা দেখতে পাই জীবনী ও পত্রসাহিত্যে। তাতে বর্ণিত ভ্রমণের চিত্র আমাদের হৃদয়ে দোলা দিয়ে যেত। সংশ্লিষ্ট সময়কালের সংস্কৃতি-কালচার, লেখকের চলাফেরা-কথাবার্তার শৈল্পিকতাও মুগ্ধ করত–হোক তা স্যার সৈয়দ কিংবা শিবলীর ভ্রমণালেখ্য, কিংবা মির্জা গালিবের 'রামপুর দারুস সুরুর', 'কলকাত্তে কে ফসানে'- আমাদের ভেতর আগ্রহের তরঙ্গ তৈরি করত। আমরা আস্বাদন করতাম ভ্রমণকাহিনির স্বাদ। অধিকাংশ দীনি গ্রন্থে বর্ণিত হতো

[১] ইউসুফ খান কম্বলপোশ। উর্দু ভ্রমণসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। লক্ষ্ণৌতে জন্মগ্রহণ করেছেন ও ইংল্যান্ডে জীবন কাটিয়েছেন। তার লিখিত উর্দুসাহিত্যের প্রথম ভ্রমণকাহিনির নাম আজাইবাতে ফিরিঙ্গি বা তারিখে ইউসুফি। তিনি ইংল্যান্ড ভ্রমণ করেছিলেন ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে। এই বইটি ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লি থেকে প্রকাশিত হয়। ইংল্যান্ড ছাড়াও উত্তর আফ্রিকার কয়েকটি মুসলিম রাজ্যও তিনি ভ্রমণ করেছিলেন।

[২] ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে আজিজ মির্জা অনূদিত 'গুলগাশতে ফিরিঙ্গি' নামে একটি সফরনামা প্রকাশিত হয়েছিল। ব্রিটেন ভ্রমণের কাহিনিসংবলিত ইংরেজি বইটি লিখেছিলেন মাহদি হাসান নামের এক লেখক। ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে 'সাইরে রুশ' নামে আরেকটি অনুবাদ প্রকাশ হয়। এই বইটি ছিল একটি ইংরেজি অনুবাদগ্রন্থের অনুবাদ। মূল গ্রন্থটি ছিল ড্যানিশ ভাষায় লেখা।

দীনি ব্যক্তিবর্গের দীনপালন ও ইলমচর্চার সোনালি গল্প। আমরা এ-ও দেখেছি যে আঠারো ও উনিশশতকের রাজনৈতিক, সামাজিক ও দাওয়াতি আন্দোলনগুলোর প্রেক্ষাপটের আলোচনায় উঠে এসেছে নানানজনের ভ্রমণবৃত্তান্ত। এই গ্রন্থগুলোকে আমরা সফরনামা হিসেবে ধরছি না। কেননা সফরনামায় কেবল লেখকের ভ্রমণকাহিনি উল্লেখ হয়।[১] যা হোক, উনিশ শতকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্রমাগত উন্নতির ফলে ভ্রমণের নানা উপাদান সহজলভ্য হয়। এ কারণে ওই শতকের শেষে ও বিশ শতকের শুরুতে ভ্রমণ যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি ব্যাপকহারে ভ্রমণসাহিত্যের ভান্ডার সমৃদ্ধ হতে থাকে। এই ভ্রমণ বিশেষত ভারতবর্ষের বাইরে আরব, ইউরোপ ও রাশিয়ায় হয়েছিল।

বিশ শতকের সফরনামাগুলো সময়-বিবেচনায় 'দিল্লির দিনলিপি'র পরবর্তী হিসেবে গণ্য হবে। কেননা এই বইয়ের সফরটি ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়েছিল। ভ্রমণকাল ও আজকের পাঠকদের মাঝে প্রায় শত বছরের দূরত্ব।[২] বিগত শতাব্দীর তুলনায় আজ সময়ের গতি বেড়েছে দ্বিগুণ। সহজগম্য ভ্রমণ পুরো পৃথিবীকে অবিচ্ছিন্ন করে তুলেছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তৃতি দূরত্ব কমিয়ে এনেছে। মানুষের রুচি-অভিরুচিতেও এসেছে পরিবর্তন। আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সামনে প্রাচীন জ্ঞানভাষ্য ঐতিহাসিক গল্প হয়ে কেবলই শুকনো পাতার মতো পড়ে আছে। তবু ইতিহাসের স্বতন্ত্র গুরুত্ব রয়েছে। নিরীক্ষাধর্মী দৃষ্টি যতই উন্নত হোক, ঐতিহাসিক বাস্তবতা নিজ ভিত্তিতেই অবস্থান করে থাকে।

দিল্লির দিনলিপি : পটভূমি

দিল্লির দিনলিপি পাঠের মাধ্যমে একটি বদলে যাওয়া সময় গভীরভাবে অনুভব করা যায় ঠিক; কিন্তু আমরা যদি বইটিকে অতীতকালের ধর্মীয় ও জ্ঞানতাত্ত্বিক গুরুত্বের পটভূমি হিসেবে দেখি, তাহলে অজানা তথ্যের উপর জমে থাকা ধুলো পরিষ্কার হতে থাকে। দৃশ্যমান হতে থাকে অতীতজীবনের নিগূঢ় বাস্তবতা। সর্বপ্রথম আমরা এই সফরনামার শিরোনাম নিয়ে ভাবি। শুরুতে এর শিরোনাম ছিল 'আরমোগানে আহবাব' বা বন্ধুদের উপহার। পরবর্তীতে *দেহলি আওর উসকে আতরাফ* (দিল্লি ও তার পরিসীমা) রূপান্তরিত হয়েছে। এমন শিরোনামের যথার্থতা ছিল। কেননা দিল্লি ছিল এক বৃহৎ সাম্রাজ্যের রাজধানী। এই সূত্রে দিল্লির জ্ঞানবিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। দিল্লির আলেম, ওলী ও সুফিরা নিজেদের ইলমি, দীনি ও সামাজিক খেদমতে অতুলনীয় ছিলেন। এই পবিত্র ভূমি এমন মহাপুরুষদের সমাধি তৈরি করেছে, যারা সমাজ ও রাষ্ট্র- উভয় পর্যায়ে রাজত্ব করেছেন। রাজধানী হওয়ার ফলে দিল্লিতে বিভিন্ন চিন্তার ক্রমবিকাশ ঘটেছে, যা বিভিন্ন পরিসীমা থেকে একত্রিত হয়ে একটি বৃহত্তর

[১] এমনও হয়েছে- উনিশশতকের কারো ভ্রমণকাহিনি বিশশতকে এসে ভিন্নজন লিখেছেন। যেমন স্যার সৈয়দের 'সফরনামায়ে পাঞ্জাব'।

[২] ২০২২ সালে এসে দূরত্ব দাঁড়িয়েছে ১২৮ বছর।

চিন্তাকেন্দ্রের রূপ ধারণ করেছে। এতে স্পষ্টভাবে দিল্লির শাসকশ্রেণির ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও কার্যদক্ষতার প্রভাব ছিল। দিল্লি শাসনের ইতিহাসে সুলতান ইলতুতমিশের শাসনামল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি আপন রাজধানীতে একত্রিত করেছিলেন দেশি-বিদেশি শাস্ত্রীয় পণ্ডিত, আলেম, উদ্যমী ও যোগ্য বন্ধুদের। সে যুগে দীনি মারকাজ স্থাপন ও সমাজসেবায় নিজের চিন্তার বাস্তবায়ন ঘটিয়ে বিস্তর অবদান রেখেছিলেন খাজা বখতিয়ার কাকী। সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবনকে নিয়ে শাহ আবদুল আজিজ সাহেবের উক্তিটিও প্রসিদ্ধ—'ইরাক খোরাসান আজারবাইজান পারস্য রোম ও সিরিয়ার ক্ষমতাধর চেঙ্গিসদের হাতে বিধ্বস্ত হওয়া মানুষগুলো পালিয়ে এসে বলবনের সুশাসিত দিল্লির বুকে সম্মানের জীবন যাপন করে থাকে।'[১] তার এ উক্তি থেকে দেহলবী আন্দোলনের ক্রমবিকাশ ও প্রকৃতি অনুধাবন করা যায়। তিনি দিল্লির বুকে গড়ে ওঠা মসজিদ, মাদরাসা; যাপিত জীবনের সুখ-সচ্ছলতা, দিল্লিবাসীর রুচি-অভিরুচি, দিল্লির ওলামা ও তাদের শিক্ষাকেন্দ্রের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

হয়তো সে যুগে বিজ্ঞানের এমন ঊর্ধ্বগতি ছিল না, তবু দূরদূরান্তে প্রভাব তৈরি করেছিল দেহলবী সংস্কৃতির ধারা। দিল্লি ছাড়া অন্যান্য শহর বা গ্রামেও বিশেষ ও ব্যাপকভাবে ছিল এর প্রোজ্জ্বল প্রভাব। দেহলবীদের এই প্রভাব ও বৈশিষ্ট্য কেবল একটি যুগের প্রচেষ্টায় ছড়ায়নি, এর জন্য দিতে হয়েছে ধারাবাহিক শ্রম। দীর্ঘকালের প্রচেষ্টায় নিজেদের যুক্ত করার সুযোগ পেয়েছিলেন দিল্লির শাসকেরা। হয়তো এ সাংস্কৃতিক কাঠামোর প্রেক্ষাপট তুলে ধরে মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী লিখেছিলেন-'শাহ ওয়ালিউল্লাহর যুগে চিন্তাগত অবকাঠামোর দিক থেকে দিল্লি এতটা উচ্চ অবস্থানে ছিল যে, সেই স্বতন্ত্র চিন্তা পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া যেত; কিন্তু যখন সে দর্শন চূড়ান্ত বিকাশের পথে, তখন রাজনৈতিক কেন্দ্র দুর্বল হয়ে পড়ে। সেকালের দূরদর্শী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের জন্য এটা বোঝা কঠিন ছিল না যে কেন্দ্রের দুর্বলতার কারণে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে প্রাদেশিক শক্তি। যার ফলে তাদের সাথে যুদ্ধবিগ্রহের মুখোমুখি হতে হবে। এরপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমে হিন্দুস্থানিদের মাঝে ধীরে ধীরে ছড়াতে থাকে ইংরেজ-ক্ষমতায়নের প্রভাব। তাদের সভ্যতার মোকাবেলা করা সহজ ছিল না। সে যুগে ইউরোপে লিবারেলিজম দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সর্বত্র। রুশো, কান্ট, নিচে[২]-রা মানবিক জীবনোদ্দেশ্য স্বাধীনতার দর্পণে রেখে দেখছিলেন। তাদের দর্শন আঁকড়ে ধরেছিল সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞান। ইউরোপ ছাড়াও বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজনীতিতে স্পষ্ট হচ্ছিল গণতান্ত্রিক উদ্দেশ্য ও সাম্রাজ্যবাদী লড়াই। ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যকে রাজনীতির অনুষঙ্গ বানানো বোধহয় সেকালের চাহিদা ছিল।

[১] শাহ ওয়ালিউল্লাহ আওর উনকি সিয়াসি ত্যহরিক, পৃষ্ঠা ৫৬

[২] নিচে (নিৎশেও লেখা হয়) বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক, কবি ও ভাষাতত্ত্ববিদ। জন্ম ১৫ অক্টোবর ১৮৪৪; মৃত্যু ২৫ আগস্ট ১৯০০ সাল।

ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজপ্রভাব দূর করতে আবশ্যক ছিল সাধারণ মানুষকে সজাগ ও সচেতন করা। শক্তিশালী ক্ষমতাসীনদের থেকে নিজেদের স্বাধীনতা উদ্ধার করতে কেবল দীনি প্রতিষ্ঠানের সংস্কারই যথেষ্ট ছিল না, রাজনৈতিক কেন্দ্রের স্থানান্তরও প্রয়োজন ছিল। তখন পর্যন্ত ফকির ও ওলীদের সম্পর্ক রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলো। পরবর্তীতে একটা সময় দীনি সংস্কারেরও প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। মূলত ইসলামের গতি-প্রকৃতিতে যুক্ত হয়েছিল জ্ঞানহীন মূর্খতা ও নানান কুসংস্কার। *আটঠারবি সদ্দি মে হিন্দুস্থানি মুআশারাত*-এর লেখক বলেন :

> সেকালে মসজিদগুলো সুনসান নীরবতা নিয়ে পড়ে থাকত। আর মাজারগুলোয় দেখা যেত উপচেপড়া ভিড়। ধর্ম থেকে সরে শিরক ও কবরপূজায় নিমগ্ন হওয়া ছিল সেকালের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। দূরদূরান্ত থেকে কাওয়ালদের দল হাজির হতো। লোকেরা মানত-নজর করত। অলস ঘোরাফেরায় সময় কাটাত।[১]

মুহাম্মদ শাহের শাসনামলে রাজনৈতিক অবস্থা ছিল নাজুক, যেমনটা আমরা আলোচনা করেছি। তখন শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ. দীনি, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের লক্ষ্য নিয়ে একটি আন্দোলন শুরুর পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এর জের ধরে দিল্লি ও এর আশেপাশে অবস্থানকারী বুদ্ধিজীবীদের আহ্বান জানান। নিজের বুদ্ধি ও কার্যক্রমের মাধ্যমে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণে সফলও হন তিনি। কিন্তু এর মানে এই নয় যে আন্দোলনটি উচ্চশ্রেণির জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। মৌলিকভাবে এই আন্দোলন ছিল সাধারণ মানুষের, যা পরবর্তী কয়েক শতাব্দীতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবীর এই আন্দোলন সম্পর্কে ডা. আবেদ হুসাইন লেখেন :

> হিন্দুস্থানি মুসলিমদের এই বিবর্ণদশার মূল কারণ ছিল মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন। এরপর ধর্মীয়, সামাজিক ও চারিত্রিক সংশোধন বা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে কেবল শাহ ওয়ালিউল্লাহ সাহেবই ভেবেছেন।[২]

তার এই চিন্তা সর্বজনীন আন্দোলনে রূপ নিল। এই আন্দোলনকে আমরা সামাজিক চৈতন্যের প্রারম্ভিক চিত্র হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। কেবল দিল্লি দেওবন্দ আলিগড় নাজিবাবাদ ও রায়বেরেলী নয়; বরং পুরো মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিমবিশ্ব ছিল এর কেন্দ্র। আন্দোলনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকের একটি বড় অংশ আজাদি আন্দোলনে যুক্ত হয়। আজাদি আন্দোলনে দীনি অঙ্গনের অংশগ্রহণ ছিল প্রশংসাযোগ্য। শাহ ওয়ালিউল্লাহ সাহেবের এই আন্দোলনের প্রসার না হলে রাজনৈতিকভাবে আজাদির লড়াইয়ে আলেমদের সপ্রশংস অংশগ্রহণ হয়তো এতটা সহজ ছিল না। কেননা পূর্বে বাদশাহদের সাথে আলেমদের তেমন কোনো সম্পর্ক ছিল না; ওয়ালিউল্লাহী আন্দোলন দীনি অঙ্গনে এই পরিবর্তনটুকুও এনেছিল।

---

[১] আটঠারবি সদ্দি মে হিন্দুস্তানী মুআশারাত, ডা. মুহাম্মদ উমর, পৃষ্ঠা ৬৭

[২] হিন্দুস্তানী মুসলমান আয়েনায়ে আইয়াম মে, পৃষ্ঠা ৬৪

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সহযোদ্ধাদের নিয়ে সুসংগঠিত একটি দলের রূপ দেন। দলটি শিক্ষা ও দীক্ষার সমন্বয়ে একদিকে আলেম ও সুফি, অপরদিকে আমির-ওমারাদের মাঝে কাজ করতে থাকেন। এই দলে ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ আশেক, মাওলানা নুরুল্লাহ বাধানবী, মাওলানা আমিন কাশ্মিরী প্রমুখ। এই একতাবদ্ধতা কেবল মূলকেন্দ্রে পড়ে রইল না, ছড়িয়ে গেল অন্যান্য এলাকাতেও। তৈরি হল বহু শাখা। আন্দোলনের প্রধানকেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হল নাজিবাবাদ মাদরাসা ও রায়বেরেলীর শাহ আলামুল্লাহ সাহেবের বসতি তাকিয়া। শাহ ওয়ালিউল্লাহ সাহেবের পর এই আন্দোলনের হাল ধরেন তার ছেলে শাহ আবদুল আজিজ দেহলবী। ইতিহাস অধ্যয়নে জানা যায় শাহ আবদুল আজিজের সময়কালে এই আন্দোলন মুসলমানদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছে। আগ্রহী যুবসমাজকে সংঘবদ্ধ করেন সাইয়েদ আহমদ শহীদ ও শাহ ইসমাইল শহীদ (শাহ ওয়ালিউল্লাহ সাহেবের নাতি)। এরপর এমন এক সংগঠনরূপে এদের আত্মপ্রকাশ ঘটে, যার উদ্দেশ্য সম্পদ অর্জন নয়, ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করা। সাইয়েদ আহমদ শহীদ এই দলটির নেতৃত্বে আসীন হওয়ার পর তিনি বিভিন্ন মহারাজা ও শিখ প্রতিনিধিদের কাছে যে পত্র লিখেছেন, তাতে স্পষ্টভাবে এ কথাগুলোই উল্লেখ হয়েছে (দিল্লির দিনলিপিতে এই মহান ব্যক্তিবর্গের সাথে লেখকের আত্মিক সম্পর্ক ও বিশ্বস্ততার চিত্র ফুটে ওঠে)।

১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে মোগল সাম্রাজ্যের শেষচিহ্নটুকুও মুছে গেল। এর দুই বছর পর শাহ মুহাম্মদ ইসহাকের দল (যিনি তখন হেজাজে অবস্থান করছিলেন) ও হাজী ইমদাদুল্লাহর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হিন্দুস্থানি আলেমদের একটি দল সিদ্ধান্ত নিল, দিল্লির আশপাশে ইমাম শাহ আবদুল আজিজ দেহলবীর নমুনায় একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা উচিত। এর সূত্র ধরে মাওলানা কাসেম নানুতবীর ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফলে দেওবন্দ মাদরাসার ভিত্তি স্থাপিত হয়। এরপর একইভাবে সাহারানপুর ও মুরাদাবাদে একটি করে মাদরাসা স্থাপিত হয়, যা ধরে নেওয়া হয় দেওবন্দের শাখা হিসেবে। দেওবন্দ মাদরাসার স্বতন্ত্র চিন্তা, তার রাজনৈতিক মতাদর্শের নীতিমালা প্রণয়ন করেছিলেন হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী এবং তার শাগরেদ মাওলানা কাসেম নানুতবী, মাওলানা রশিদ আহমদ গঙ্গুহী, মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী প্রমুখের সম্মিলিত জামাত (দিল্লির দিনলিপিতে দারুল উলুম দেওবন্দের এই দিকগুলো নিয়ে কয়েকটি স্থানে ইঙ্গিত দিয়েছেন লেখক)। আলোচিত আন্দোলনটির বড় একটি উদ্দেশ্য ছিল- বিভিন্ন স্থানে মাদরাসা থেকে শিক্ষা সমাপন করা আলেমরা যেন মসজিদ ও মাদরাসায় কাজ করতে প্রস্তুত থাকে। পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান লাভের পর তারা যেন বড় বড় বুজুর্গদের সংস্পর্শে থেকে শাহ ওয়ালিউল্লাহর চিন্তা ও দর্শনের সাথে পরিচিতি অর্জন করে।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে দারুল উলুম দেওবন্দের প্রথম যুগ শেষ হয়েছে মাওলানা রশিদ আহমদ গঙ্গুহীর ইনতেকালের মধ্যদিয়ে। সে যুগে ওয়ালিউল্লাহী আন্দোলন ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়েছিল। শাহ সাহেবের চিন্তা ছড়িয়ে পড়েছিল। এই

আন্দোলন হিন্দুস্থানের সীমানা পেরিয়ে আফগানিস্তান তুর্কিস্তান হেজাজ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার পেছনে কয়েকটি উদ্দেশ্য ছিল। ইসলামি সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ, সামাজিক সচেতনতা, অর্থনৈতিক সাম্য ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্ন ভাবনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দীনের মৌলিক দিকগুলোর প্রসার ও শিক্ষাদানের জন্য আমলি প্রচেষ্টা ছিল দেওবন্দী আদর্শের একটি অংশ। হিন্দুস্থানে আলিগড় আন্দোলনের মাধ্যমে ধর্মীয় সংস্কারের যে প্রচেষ্টা ছিল, তার ধারাবাহিকতা কমবেশি ওয়ালিউল্লাহী আন্দোলনের সাথেই মিলে যায়। যেমনটা ডা. আবেদ হুসাইন লিখেছেন :

> আলিগড় আন্দোলনের মাধ্যমে ধর্মীয় সংস্কারের যে চেষ্টা করা হয়েছিল, এর মৌলিক চিন্তা শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী অনেক আগেই প্রকাশ করে গিয়েছিলেন।[১]

শাহ সাহেবের সেই আন্দোলনের বিভিন্ন ধারণা ও চিত্র রাজনৈতিক, দীনি বা সামাজিক গ্রন্থগুলোতে বিক্ষিপ্তভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে।

দিল্লির দিনলিপি : পটভূমি

এই বইটিতে মাওলানা হাকিম সাইয়েদ আবদুল হাই দিল্লির বিভিন্ন[২] দরসগাহ ভ্রমণ করে এমন সব ব্যক্তির কথা তুলে এনেছেন, যারা উল্লিখিত আন্দোলনের পতাকাবাহী ছিলেন। তাদের আলোচনার মাধ্যমে প্রায় দুইশ বছরে বিস্তৃত হওয়া ওয়ালিউল্লাহী আন্দোলনের পটভূমি দৃশ্যমান হয়। দিল্লি ও তার চারিদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মাদরাসাগুলোতে লেখকের এই ভ্রমণ ওই আন্দোলনের নতুন এক মাত্রা উন্মোচিত করে। লেখক দিল্লি দেওবন্দ নাজিবাবাদ সাহারানপুর নানুতা আম্বেটা গঙ্গুহ রুড়কি ভ্রমণকালে অনেক বুজুর্গের সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে শাহ আবদুল আজিজ, শাহ ইসমাইল শহীদ এবং বিশেষভাবে সাইয়েদ আহমদ শহীদের স্মৃতিচারণ করেছেন। তাদের সম্পর্কে শুনতে ও বলতে চেয়েছেন। হয়তো এ কারণেই ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী যখন *সিরাতে সাইয়েদ আহমদ শহীদ* লিখতে ইচ্ছে করেছিলেন তখন তিনি ও সুলাইমান নদবী সাহেব এই বইটির পাণ্ডুলিপি গভীরভাবে অধ্যয়নের প্রয়োজন অনুভব করেন। যেমনটা তিনি লিখেছেন :

> সৌভাগ্যক্রমে একদিন মাওলানা সুলাইমান নদবী মরহুম আমার ঘরে আসেন। *সিরাতে সাইয়েদ আহমদ শহীদের* পাণ্ডুলিপিতে এই বইটির সূত্র দেখে বইটি পড়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন।[৩]

আমাদের হাতে থাকা সফরনামাটি নব্বই বছর (বর্তমানে ১২৯ বছর) আগে লেখা হয়েছে। আজও এর দিকে তাকিয়ে বিগত সভ্যতার সাথে ন্যূনতম সম্পর্কধারী পাঠকও স্বাদবঞ্চিত হবেন না। গল্পগুলো খুব বেশি আগের নয়। ইতিহাসে এক শতকের দূরত্ব

---

[১] হিন্দুস্তানী মুসলমান আয়েনায়ে আইয়াম মে, পৃষ্ঠা ৬৩

[২] ভ্রমণটি শুরু হয়েছিল ফতেহপুর জেলার হাঁসওয়া এলাকা থেকে। এরপর দিল্লি দেওবন্দ নাজিবাবাদ সাহারানপুর নানুতা আম্বেটা গঙ্গুহ রুড়কিসহ বিভিন্ন এলাকা তিনি ভ্রমণ করেন।

[৩] ভূমিকা- দেহলি আওর উসকি আতরাফ- ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দ।

বেশি বলা যায় না। পরিবর্তন তো মুহূর্তেই হয়ে যেতে পারে, পালটে দিতে পারে সভ্যতার ভিত্তি। কিন্তু প্রতিটি বিবর্তনীয় স্থান তার পূর্বাবস্থার সাথে সংযোগ রাখে। তাকে 'প্রাচীন' বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই সফরনামাটি চিত্তাকর্ষক হওয়ার পেছনে বহু কারণ রয়েছে। যিনি ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন, জ্ঞানবিজ্ঞানের সাথে ছিল তার সত্যিকারের ভালোবাসা। নিজেদের সভ্যতার প্রতি ছিল আত্মিক টান। বুজুর্গদের জীবনীর প্রতি ছিল পূর্ণ আস্থা-বিশ্বাস ও সম্মানজনক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমকালীন প্রবীণ ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাতের প্রবল আগ্রহ। আমরা দেখতে পাই, তিনি বিভিন্ন মাদরাসা ভ্রমণ করেন ও পূর্ণ স্বাদ গ্রহণ করে তবেই ক্ষান্ত হন; পুরো ইসলামি ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞাত বলেই তা সম্ভব হয়েছে। ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলো তিনি নিয়মমাফিক পড়াশোনা করেছেন। এ পথে আগত নানা জটিলতা তিনি হজম করেছেন।

জ্ঞানী ও নির্জ্ঞান পর্যটকের পর্যবেক্ষণে রয়েছে বিরাট ফারাক। আমরা যার ভ্রমণকাহিনি পড়ছি, তিনি বিচার-বিশ্লেষণের দ্বার উন্মুক্ত করেছেন; আত্মতৃপ্তি লাভের আশায় অভিজ্ঞতার কণ্টকাকীর্ণ পথে হেঁটেছেন। এই সফরনামায় আমরা দেখতে পাই লেখক বিভিন্ন স্থানে মসজিদ-মাদরাসায় হাদিস ও তাফসিরের দরসে বসেছেন। গভীর নিমগ্নতার সাথে দরস শুনেছেন। সে যুগের সেমিনার-কনফারেন্স যে নামেই বলুন, জ্ঞানার্জন ও চিন্তার পুনর্গঠনে এই মজলিসগুলোই ভূমিকা রাখত। জোহর, মাগরিব, ইশা বা ফজরের পর এই দীনি মজলিসগুলো অনুষ্ঠিত হতো। দূরদরাজ থেকে লোকেরা ছুটে আসত শিক্ষাগ্রহণের মহান লক্ষ্যে। ফিকহ-ফতোয়া নিয়ে দ্বিধাহীন আলোচনা হতো। এই বইয়ের একটি বৈশিষ্ট্য হল, এই গল্পগুলো লেখক নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। লেখক কোনো অতিশয়োক্তি ছাড়া সোজাসাপ্টা বিবরণ তুলে ধরেছেন ডায়েরির পাতায়। এক স্থানে তার ধারণা এভাবে তুলে ধরেন :

> সেদিন ভোরেও পথ কর্দমাক্ত ছিল। তবু দরসে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম। বের হওয়ার পর লক্ষ করলাম, পথের অবস্থা এতটাই জরাজীর্ণ যে দু'চার কদম ফেলাই মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। তবু কষ্ট সহ্য করে সাতটার মধ্যে দরসগাহে পৌঁছুলাম। গিয়ে দেখি *বুখারি শরিফের* দরস শুরু হয়ে গেছে; বসে পড়লাম। এরপর *সহিহ মুসলিমের* মুকাদ্দিমার দরস হল। তাত্ত্বিক প্রশ্ন এড়িয়ে খুবই সাদামাটা আলোচনা। *মুসলিমের* মুকাদ্দিমা শেষ হলে শুরু হয় *বাইযাবি শরিফ*। নজির সাহেবের ভাতিজা আবদুল হাফিজ সবক পড়াচ্ছিলেন। তার পড়া খুবই বাজে ধরনের ছিল। তিনি বুঝে পড়তে পারছিলেন না। বারবার ইবারতে ভুল হচ্ছিল। এতে উপস্থিত ছাত্ররাও নিশ্চিতভাবেই সঠিক মর্মোদ্ধারে সক্ষম হচ্ছিল না। তবে এসব কারণে নজির সাহেবের প্রতি ভুল ধারণা করা অনুচিত। বার্ধক্যের ফলে তার পাঠদানে এদিক-ওদিক হতেই পারে।

সমকালীন বুজুর্গদের সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে লেখক অর্জন করেছেন বিভিন্ন দীনি ও সামাজিক কার্যক্রমের কর্মপদ্ধতি। সফরনামায় দৃশ্যমান হয়- লেখক যেখানেই গিয়েছেন, সেই স্থান ও সেখানকার বুজুর্গদের দুর্লভ তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তার

সমুন্নত জ্ঞানের প্রমাণ মেলে প্রতিটি ক্ষেত্রে, নিজেদের সময় ও ইতিহাস নিয়ে তার জানাশোনা পরিলক্ষিত হয়। নিচের কয়েক লাইন থেকে এই সফরনামার গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় :

> শাহ আবদুর রহিম সাহেবের পিতা শাহ ওয়াজিহুদ্দীন সাহেব সর্বপ্রথম রোহতক থেকে দিল্লিতে আসেন। এরপর মাওলানা আবদুর রহিম রহ. দিল্লিতে স্থায়ী হয়ে যান। তিনি থাকতেন মেহেন্দিয়ানে, যেখানে এখন তার কবর। সেখানে ছিল মাদরাসা-মসজিদ। শাহ সাহেবের বিশেষ একটি কামরাও ছিল। সবই বিলীন হয়ে গেছে। এখন যে মসজিদটি সেখানে আছে, তা শাহ ইসহাক সাহেবের সময়ে তার কোনো ভক্ত নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। মেহেন্দিয়ানে কবরস্থানের সীমানারও এখন জীর্ণদশা। শাহ আবদুর রহিম সাহেবের পর শাহ ওয়ালিউল্লাহ সাহেব দিল্লিতে আসেন। মাদরাসার দায়িত্ব তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। ফলে তিনিও মেহেন্দিয়ানে অবস্থান করেন। এ সংক্রান্ত কিছু আলোচনার পর আমি বিদায় নিলাম। কিন্তু মাওলানা সাহেব আমার বারবার নিষেধের পরেও গলির শেষপ্রান্ত পর্যন্ত এগিয়ে এলেন। পথ চলার সুবিধার্থে হ্যারিকেন হাতে একজন খাদেম আমার সাথে দিয়ে দিলেন। জামে মসজিদের কাছাকাছি এসে হ্যারিকেনধারী খাদেমকে বিদায় দিয়ে দিলাম। কারণ রাস্তায় যথেষ্ট আলো ছিল। এদিকের পথও আমার চেনা-জানা।

এই সফরনামার একটি বড় অংশজুড়ে রয়েছে বিভিন্ন মাদরাসা ও মাজার জিয়ারতের গল্প। দিল্লি ও তার আশপাশে অনেক বুজুর্গ ও ঐতিহাসিক ব্যক্তির কবর রয়েছে। কবরগুলো লেখক জিয়ারত করেছেন; সাথে সাথে সফরনামায় ঐতিহাসিক প্রমাণসহ উল্লেখ করেছেন তাদের যুগের কথা। তথ্যসমৃদ্ধ অংশগুলো এই বইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। আমাদের ধর্মীয় জীবনে মাজার জিয়ারত গুরুত্বের সাথেই জড়িয়ে আছে। কিন্তু সফরনামার বিবরণ থেকে বোঝা যায়, লেখক প্রচলিত পদ্ধতিতে মাজার জিয়ারত না করে কেবল সুরা ফাতিহা পড়েছেন, দোয়া করেছেন; ফুল ছিটানো, মানত করা, সিজদা করা থেকে বিরত থেকেছেন। বরকতস্বরূপ মাজারের পানিও পান করেননি। অথচ এমন অনেক কুসংস্কার আমাদের ধর্মীয় জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে। লেখক যখন দিল্লির কদম শরিফে গিয়েছেন, ওখানকার খাদেম রাসুল সা.-এর পদচিহ্নধারী পাথরের উপর থাকা পানি বরকতস্বরূপ দিতে চেয়েছিলেন, তিনি তা গ্রহণ করেননি। সেই সময়কালটা ছিল বড্ড কঠিন। কোনো ধর্মীয় রীতিনীতির বিরুদ্ধাচরণ করলে সাধারণ মানুষ ক্ষেপে উঠত। মন্দ বলতে কৃপণতা করত না। রাগে-ক্ষোভে 'জাহান্নামি' ফতোয়া ছুড়ে দেওয়ার ঘটনাও ঘটত। লেখক দিল্লিতে অবস্থানকালে জামে মসজিদে বয়ানে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, যে লোকটি হানাফি ফিকহের বিরুদ্ধে কথা বলত, সে প্রতিপক্ষের লোকেদের জাহান্নামি বলতেও দ্বিধা করত না। এই গল্পগুলো 'দিল্লি শাহী জামে মসজিদে বক্তাদের হাঙ্গামা' শিরোনামে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন লেখক। উপস্থাপিত হয়েছে বক্তাদের কাদা ছোড়াছুড়ির

দৃশ্য। পুরো সফরনামায় দুয়েকটি স্থানে এমন গল্প ছাড়া পুরো বইটি জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় পূর্ণ। তবে সাদাসিধে ভঙিমায়ও তিনি জানিয়েছেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

ইসলাম ও ভারতবর্ষের ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে গবেষণার স্বার্থে এই বইটি হীরক সমতুল্য। উনিশ শতকের শেষদিকের কিছু ব্যক্তির কথা এই বইয়ে উঠে এসেছে, যাদের ব্যাপারে স্যার সৈয়দ আহমদ খান তার *আসারুস সানাদিদে*ও সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন; তবে দুটি বইয়ের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন। দীনি ও ইলমি দিক বিবেচনায় এই দিনলিপির সাথে তার পার্থক্য গড়ে উঠেছে। দিল্লি সফর-করা-পর্যটকদের জন্য সেখানকার ঐতিহাসিক নিদর্শনাবলি ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা উচিত। আমাদের লেখকও দেখেছেন। এমন প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন পর্যবেক্ষণকালে তার হৃদয়ের অভিব্যক্তি কীভাবে ফুটে ওঠে দেখুন :

> পাঠক, আমায় ক্ষমা করবেন। সেই বিবর্ণ ভূমির দিকে তাকিয়ে আমার হৃদয় নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ল। কালো হরফের মাধ্যমে ব্যক্ত করতে পারছি না সে মুহূর্তের বর্ণনা। আমার আঁখিজোড়া বারবার অশ্রুসজল হল। যারা এই দরবারের ঐতিহ্যমাখা ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞাত, তারা এই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া আটপৌরে কেল্লার দিকে তাকিয়ে কীভাবে অশ্রুসংবরণ করতে পারে! তাদের হৃদয় তো নিয়ন্ত্রণ হারাবে, ঝঞ্ঝার ন্যায় শরীরে বয়ে যাবে লোমহর্ষণ, চোখের সামনে উন্মুক্ত হবে আল্লাহর শক্তি ও দাপটের নিদর্শন; তারা দেখতে পাবে, সত্যিই পৃথিবী নশ্বর। শুধু সামান্য সময়ের জন্য *হাদিকাতুল আকালিমের*[১] পাতা খুলে মুহাম্মদশাহী দরবারের দৃশ্য অবলোকন করুন, লক্ষ করুন আলমশাহী দরবারের পতনকাল- এরপর ফিরে আসুন বাস্তবে এবং এই জরাগ্রস্ত ক্ষয়প্রাপ্ত দেয়ালগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখুন। দেখুন- আড়ম্বরপূর্ণ শাহানশাহী কীভাবে নিমেষেই নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ ছাড়া আর সবই নশ্বর।

আগেও বলেছি, দিল্লি ছাড়াও এর আশপাশের বিভিন্ন স্থানে অনেক মাদরাসায় লেখক ভ্রমণ করেছেন। ওখানকার সাধারণ মানুষের দীনি অবস্থা বোঝার চেষ্টা করেছেন। বরকত লাভের আশায় আকাবির-মাশায়েখের পাশে বসেছেন। পুরোনো দিনের গল্প শুনেছেন। বিভিন্ন জেলা, শহর ও গ্রাম ঘুরে সেসবের তুলনামূলক পর্যালোচনা করেছেন। এক স্থানে তিনি যেমনটা লিখেছেন :

> তখন পর্যন্ত সাহারানপুরের যতগুলো গ্রামে গিয়েছি, প্রতিটি গ্রামের মানুষকেই সাইয়েদ সাহেবের স্মৃতিচারণ করতে শুনেছি। সাইয়েদ সাহেবের প্রতি তাদের ভালোবাসা ছিল বর্ণনাতীত। সবাই একমত হয়ে বলছিলেন 'আমরা ছিলাম নামমাত্র মুসলিম। ঈমান ও ইসলামের সঠিক পথ আমরা তার থেকেই পেয়েছি।' সাহারানপুরের পির-মাশায়েখরা সাইয়েদ সাহেবের সিলসিলাকেই অগ্রগণ্য ধরে থাকেন। আমি আমার জীবনে এত ব্যাপকভাবে সাইয়েদ সাহেবের চর্চা অন্য কোথাও হতে দেখিনি। ওদিকের মসজিদগুলো মুসল্লিতে পূর্ণ। সবসময় ওজুখানায়

[১] বইটির লেখক আলা ইয়ারখান বলগ্রামী।

পানি ঝড়ছে। প্রতিটি মুসলমান অন্তত নামাজ ও তেলাওয়াতে আগ্রহী। আমার ধারণা সাহারানপুরের মন্দ লোকগুলো আমাদের এলাকার ভালো লোকেদের তুলনায় উত্তম।

এই সফরনামা থেকে ঐতিহাসিক স্থানসমূহের বিবরণ ছাড়াও প্রাচীন কিতাবাদি, ইসলামি তাসাউফের ধারাবাহিকতা, খানকাহ, হাদিসগ্রন্থ, দরসগাহ, মসজিদ, পশ্চিম ইউপির গ্রাম-শহর, বয়োবৃদ্ধ লোকেদের সাথে কথোপকথন, তাদের দরসগ্রহণ বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত আরবি ফারসি পঙক্তির মতো উপাদান পাওয়া যাবে। লৌকিকতা ও অতিশয়োক্তি ছেড়ে সংক্ষেপ ও সমৃদ্ধ বর্ণনার মাধ্যমে বইটির বৈশিষ্ট্য তৈরি হয়েছে। একজন আলেমের রচনায় সাধারণত ইলমি পরিভাষা ও আরবি ফারসি বৈয়াকরণিক আলাপ অধিকহারে লেপটে থাকে। কিন্তু বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে লেখক তার সুখপাঠ্য গদ্যে বিভিন্ন পরিভাষা এমনভাবে যুক্ত করেছেন, যা গদ্যের প্রবহমানতা এতটুকু ক্ষুণ্ণ করেনি। একইভাবে গ্রন্থে বর্ণিত আরবি ফারসি পঙক্তিগুলোও মূল গদ্যের অংশই মনে হয়। উর্দুসাহিত্যে গদ্যের ফাঁকে ফাঁকে সহজবোধ্য পঙক্তির ব্যবহার উনিশ শতকেই শুরু হয়েছে। বক্ষ্যমাণ সফরনামাও সাহিত্যের সেই নতুন ধারায় নিজেকে মেলে ধরেছে।

সাদেকা যাকী

দিল্লির দিনলিপি

১৪ রজব ১৩১২ হিজরি, শনিবার।

এই দিনটি ছিল আমার মহাকাব্যিক ভ্রমণের প্রারম্ভকাল। নেহাত মনোরঞ্জনের জন্য নয়, বেরিয়েছিলাম অস্তিত্বের খোঁজে, জ্ঞানসমৃদ্ধির লক্ষ্যে, যেন জীর্ণ বসনে নেমেছিলাম শত কাঁটা-ঝোপ মাড়িয়ে মহাকালের আলোকসন্ধানে। চলুন, শুরু করা যাক।

ঘর ছেড়ে বেরোবার পর আমাকে দূরের পথে বিদায় জানাতে স্বজনরা এগিয়ে এলেন স্টেশন অবধি।[১] কিছুক্ষণ পর যথাসময়ে ট্রেনটি প্লাটফর্মে প্রবেশ করল। স্বজনরাও বিদায় জানিয়ে নীড়ে ফিরলেন। আমি উঠে বসলাম সুদীর্ঘ যানটিতে। দিল্লি পর্যন্ত এর ভাড়া গুনতে হচ্ছে তিন আনা। আমি আসন গ্রহণ করলাম। ভেতরে দীর্ঘ ভ্রমণের প্রথম দিনের উত্তেজনা। চারিদিকে নানা গন্তব্যের মানুষ গিজগিজ করছে। সবাইকে বহন করে কিছুক্ষণ পরই ট্রেনটি বিকট শব্দে হুইসেল বাজিয়ে সম্মুখ-পানে এগিয়ে চলল। কর্ণকূহরে বিদ্ধ হল ট্রেনের বিরতিহীন চিৎকার—ঝকঝক ঝকঝক। জানালা দিয়ে তাকালাম, দেখলাম— আমাদের ছোট স্টেশনটি ক্রমে আরও ছোট হয়ে আসছে দৃষ্টিতে।

কিছুক্ষণ পরই ফতেহপুর জংশনে যাত্রাবিরতি। বাইরে তাকিয়ে দেখলাম মৌলবী জহুরুল ইসলাম সাহেব[২] প্লাটফর্ম ছেড়ে ট্রেনের দিকে এগিয়ে আসছেন। সাথে মৌলবী নুর মুহাম্মদ সাহেবও ছিলেন।[৩] হঠাৎ দুটি পরিচিত মুখ দেখে প্রীত হলাম। এরা এসেছেন সদ্য হজের সফরে-বের-হওয়া শেখ মুহাম্মদ হুসাইন সাহেবকে বিদায় জানাতে। সামান্য বিরতির পর ট্রেনের হুইসেল বেজে উঠল। তারা বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। আর আমরা এগিয়ে চললাম ফতেহপুর ছেড়ে। রাত গভীর হতে থাকল। একের পর এক চেনা-অচেনা শহর-গ্রাম-পল্লী পেরিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম ঐতিহ্যের শহর—দিল্লি অভিমুখে।

---

[১] এই সফরের সূচনা হয়েছিল ফতেহপুর জেলার হাঁসওয়া এলাকা থেকে। যেখানে লেখকের নানাবাড়ি ও মাতুলবংশীয় নিবাস। (সু)

[২] সাইয়েদ জহুরুল ইসলাম। উনি ছিলেন ফতেহপুরের প্রসিদ্ধ আলেম। মাওলানা লুতফুল্লাহ সাহেবের শাগরেদ ও মাওলানা ফজলুর রহমান গঞ্জমুরাদাবাদী রহ.-এর মুরিদ ছিলেন। (সু)

[৩] ফতেহপুর মাদরাসায়ে ইসলামিয়ার প্রথম শিক্ষক। উনিও মাওলানা লুতফুল্লাহ সাহেবের শাগরেদ ও মাওলানা ফজলুর রহমান গঞ্জমুরাদাবাদী রহ.-এর মুরিদ ছিলেন। পাঞ্জাবের শাহপুরে তার বাড়ি। ফতেহপুরে ইনতেকাল করেছিলেন। (সু)

দিল্লি : আমাদের হারানো সালতানাত

১৫ রজব ১৩১২, রবিবার।

সকাল দশটায় দিল্লি জংশনে আমাদের ট্রেনটি থামল। দীর্ঘ একরাতের ক্লান্তি ঝেড়ে ট্রেন থেকে নামলাম। স্টেশন থেকে বেরোতেই সামনে ভেসে ওঠে দিল্লির দৃশ্যপট। এই প্রাচীন শহর-পানে তাকিয়ে মনে হল, আজকাল বড় উপমেয় হয়ে উঠেছে শহরটি। আগের সেই জৌলুস নেই। প্রায় পাঁচশ বছরের মুসলিম সালতানাত এখন ইংরেজদের হাতে শাসিত হচ্ছে। এসব ভাবতেই তনুমন শিউরে ওঠে।

صدق الله تعالى، تلك الايام نداولها بين الناس فانا لله وانا اليه راجعون[১]

সুবিশাল রেল স্টেশনটি শহরঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। স্টেশন ছেড়ে সোজাপথে কিছুদূর এগোলেই আমাদের গন্তব্যস্থল—ছনামেল সরাইখানা। দিল্লিতে যতদিন থাকব, আমার থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত হবে এখানেই। সরাইখানায় আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন ভাই সাহেব মৌলবী খলিলুদ্দীন।[২] আমার আগেই এসেছেন তিনি। অপেক্ষার যন্ত্রণা থেকে তাকে মুক্ত করতে দ্রুত এগিয়ে চললাম সরাইখানার দিকে।

ছনামেল সরাইখানা : পনেরোদিনের বিশ্রামগাহ

পৌঁছুতে বেশি সময় লাগেনি। আমার অপেক্ষায় থাকা ভাই সাহেব হাস্যোজ্জ্বল মুখ নিয়ে এগিয়ে এলেন। সংক্ষেপে শেষ হল কুশলাদি-পর্ব। সরাইখানার চারপাশ দৃষ্টিনন্দন। একটি ছোট খাল বয়ে যাচ্ছে সামনের দিকটায়, দশ কি বারো হাত প্রশস্ত; দরজায় দাঁড়ালেই তার বহমানতা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। খালের সাথে সেতু-সংযোগে ওপারে যাওয়া যায়। ওপারে সামান্য দূরেই একটি মসজিদ। মসজিদটির প্রতিষ্ঠাতা গাজিউদ্দীন খাঁ।[৩] সামান্য বিশ্রামের পর এই মসজিদেই আমরা জোহরের নামাজ আদায় করলাম। নামাজ শেষে দুজনেরই ইচ্ছে হল কোম্পানিবাগ দেখার। সুবিশাল বাগানটি স্টেশন ও সরাইখানার কাছাকাছি। যতটা আগ্রহ নিয়ে গেলাম, ঠিক ততটা হতাশ হয়ে ফিরে এলাম। চিত্তাকর্ষক কিছু পেলাম না সেখানে। পরে এগিয়ে গেলাম তিব্বিয়া কলেজ অভিমুখে।

---

[১] মর্মার্থ- আল্লাহ সত্য বলেছেন; এ দিনগুলো আমি মানুষের মাঝে আবর্তিত করে থাকি। আমরা তো আল্লাহরই, আর নিশ্চয় আমরা তার দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।

[২] মৌলবী খলিলুদ্দীন রায়বেরেলী লেখকের ফুফাতো ভাই। তিনি চিকিৎসার উদ্দেশ্যে দিল্লিতে গিয়েছিলেন। (আ) পুরো বইয়ে তাকে 'ভাই সাহেব' বলেই সম্বোধন করা হবে। (অনুবাদক)

[৩] গাজিউদ্দীন খাঁ- প্রথম ফিরোজ জঙ্গ (১৬৪৯-১৭১০)

তিব্বিয়া কলেজে

তিব্বিয়া কলেজে[১] যাওয়ার উদ্দেশ্য হাকিম ইমাদুল হাসান সফিপুরির ছেলে হাকিম ফজলুল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করা। হাকিম ফজলুল্লাহ এই কলেজে প্রথমবর্ষের শিক্ষার্থী। আমরা গিয়ে দেখি পরীক্ষাকালীন বিরতি চলছে। শিক্ষার্থীরা গভীর পাঠমগ্ন। হাকিম ফজলুল্লাহকে খুঁজে পেতে বেগ পেতে হল না। প্রাথমিক কুশলাদি সেড়ে নানান বিষয়ে আমাদের আলাপচারিতা শুরু হল। কলেজের শিক্ষাকার্যক্রম সম্পর্কে বেশ ধারণা পেলাম তার থেকে।

চিকিৎসাবিদ্যার ক্ষেত্রে বিশ্লেষণী কার্যক্রমের প্রয়োজন ব্যাপক। কলেজে এই কাজে নিয়োজিত আছেন একজন চিকিৎসক। তার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রতিটি চিকিৎসা-পদ্ধতির ব্যাখ্যা জেনে থাকে। প্রথমবর্ষের শিক্ষার্থীরা ক্লিনিকে প্র্যাকটিস করার সুযোগ পায়। নিজেদের বইকেন্দ্রিক জ্ঞানকে হাতে-কলমে ঝালিয়ে নেওয়ার এই মোক্ষম ব্যবস্থা। মাসে দুই সপ্তাহ করে হাকিম আবদুল মাজিদ খান ছাত্রদের সময় দিয়ে থাকেন। রোগীদের 'ঔষধ নির্দেশনা'র খুটিনাটি শেখান ছাত্রদের। বাকি দুই সপ্তাহ ছাত্ররা সরকারি সিভিল সার্জনের তত্ত্বাবধানে হাসপাতালে সরাসরি চিকিৎসা কার্যক্রম দেখে। প্রথমবর্ষের শিক্ষার্থীরা সমাপনী পরীক্ষা শেষে এক বছর দাওয়াখানায় প্র্যাকটিস করে। এজন্য তাদের আলাদা করে সনদও প্রদান করা হয়। প্রত্যেক শ্রেণির পড়াশোনা এক বছরে সীমাবদ্ধ। এভাবে অতিক্রম করতে হয় চারটি শ্রেণি। ঔষধ তৈরির ক্ষেত্রেও নেওয়া হয় আলাদা পরীক্ষা।

সব মিলিয়ে কলেজের শিক্ষাব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত। তবে ক্লিনিকাল সুযোগ-সুবিধা পর্যাপ্ত নয়। অধিকাংশ রোগীর চিকিৎসায় শুধুমাত্র ওষুধের ব্যবহার ঘটানো হয়। ঔষধ নির্দেশনার তালিকাটিও বহু ব্যবহৃত। ছাত্ররা বেশ কষ্টেই তা মুখস্থ করে। অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থাপনা সমৃদ্ধ নয়। সবদিক বিবেচনায় মনে হল, যে শিক্ষার্থী এখান থেকে পড়াশোনা শেষ করে লক্ষ্ণৌ ফিরে যাবে, এই কষ্টার্জিত বিদ্যা ধরে রাখার আগ্রহ সে হারিয়ে ফেলবে। এ ছাড়া কলেজের শিক্ষা-কার্যক্রমে বাহ্যত কোনো ত্রুটি চোখে পড়েনি।

ফতেহপুরী মসজিদ : শাহজাহানপত্নীর অমর কীর্তি

মৌলবী ফজলুল্লাহ আমাকে আসর পর্যন্ত সময় দিলেন।

সেখান থেকে বিদায় নিয়ে ফতেহপুরী মসজিদের[২] দিকে চললাম। যেতে যেতে নামাজের সময়ও হয়ে এল। মসজিদে প্রবেশ করতেই একরাশ মুগ্ধতায় মন ভরে উঠল। অপার শিল্প-সৌন্দর্যে ভরপুর আলীশান মসজিদ এটি। মাঝখানের সদর দরজাটি সুপ্রশস্ত। তার উভয়দিকে একই প্রকৃতির চারটি করে দরজা নির্মিত হয়েছে। বড়

[১] তিব্বিয়া কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হাকিম আবদুল মাজিদ খান রহ.। (সু)

[২] পুরান দিল্লির চাঁদনিচকে অবস্থিত এই মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন সম্রাট শাহজাহানের স্ত্রী ফতেহপুরী বেগম। এর নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয় ১৬৫০ খ্রিষ্টাব্দে।

দরজাটির উপরাংশে খত্তে নুসাখ ও কুফিতে নিখুঁতভাবে লেখা আল্লাহর নাম ও কালিমা শোভা পাচ্ছে। মিম্বারের সামনের অংশটুকু নির্মিত হয়েছে মসৃণ পাথরে। এর উপর নিপুণ শিল্পের কারুকার্য তাকে করে তুলেছে অনন্য। মসজিদের প্রাঙ্গণ সুবিশাল। এর একদিকে তৈরি করা হয়েছে মনোরম জলাধার; তার পারের সিঁড়িগুলো নেমে গেছে পানিতে। চারিদিকে বসে সহজেই ওজু করতে পারে মুসল্লিরা। মসজিদের সীমানার চারিদিকে বন্ধনীর মতো গড়ে তোলা হয়েছে প্রাচীর। পাখির চোখে তাকালে একটি দুর্গের মতোই মনে হবে মসজিদটি। মসজিদ-সীমানা ছেড়ে বেরোলেই শুরু হয় হরেক রকম পণ্যের পসরা সাজিয়ে বসা সারি সারি দোকানপাট।

সাইয়েদ নজির হুসাইন সাহেবের সংশ্রবে

আমরা ফতেহপুরী মসজিদ থেকে বেরিয়ে জশন খাঁ ফটকের দিকে এগিয়ে চললাম। উদ্দেশ্য, নজির হুসাইন সাহেবের[১] সাক্ষাৎ লাভ। ভাগ্য আমাদের সুপ্রসন্নই বলতে হয়। তার আস্তানায় পা রাখার আগেই পথিমধ্যে তাকে পেয়ে গেলাম। সালাম বিনিময় হল। এরপর একসাথে হেঁটে তার মসজিদে পৌঁছুলাম। পথে তেমন কথাবার্তার সুযোগ পেলাম না। মসজিদে বসে আলাপের শুরুতেই পরিচয় দিলাম। এরপর অভ্যাস অনুযায়ী শুনতে চাইলাম 'মুসালসাল বিল আওয়ালিয়াহ'।[২] তিনি মুচকি হেসে উপস্থিত একজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাদের হজরতরা এমন কিছুতে গুরুত্ব দেননি।' এরই মধ্যে এক তালিবুল ইলম ফতোয়া দেখাতে এলে তিনি সেদিকে মনোযোগী হলেন। ফতোয়াটি ছিল এমন, 'যায়েদ তার শ্বশুরকে পত্র মারফত জানিয়েছে, আপনার কন্যা জেবুন্নেসাকে এক বছর পর্যন্ত তিন তালাক দিয়েছি।' এই প্রশ্নের উত্তরে নজির সাহেবের ছাত্র বলেছে, তালাক হয়নি। কারণ, তালাকের জন্য সম্বোধন আবশ্যক, আর এখানে সম্বোধন পাওয়া যায়নি। মৌলবী সাহেব ছাত্রের কথা শুনে বললেন, 'বেটা, সম্বোধনের তো নানান প্রকারভেদ আছে। নাম, পদবি ও ইঙ্গিতের মাধ্যমেও কাউকে সম্বোধন করা যায়। তোমার মাসআলার ক্ষেত্রে নামের মাধ্যমে জেবুন্নেসাকে সম্বোধন করা হয়েছে।' এরপর শাসানোর স্বরে বললেন, 'মাসআলা পর্যবেক্ষণ করতে আরও মনোযোগী হতে হবে'।

এই ফতোয়ার সূত্র ধরে উপস্থিত সবাইকে তিনি একটি গল্প শোনালেন। ফিকহের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *আল-বাহরুর রায়েকের* লেখকরা ছিলেন দুইভাই। *আল-বাহরুর রায়েক* রচয়িতার পাণ্ডিত্য ছিল ফতোয়াপ্রদানে। ছোটভাই উমর বিন ইবরাহিম ইবনে নুজাইমের পাণ্ডিত্য ছিল পাঠদানে। একবার বড়ভাই অসুস্থ হলে তার মসনদে বসলেন ছোটভাই। এক ধনকুবের প্রশ্ন পাঠাল, 'আমি গোসলখানায় সওয়ারি জন্তুসহ প্রবেশ করি। এ

[১] সাইয়েদ নজির হুসাইন দেহলবী (১৮০৫-১৯০২) ছিলেন বিখ্যাত হাদিসবিশারদ, আহলে হাদিস আন্দোলনের অন্যতম রূপকার ও সংস্কারক। তার উসতাদ ছিলেন শাহ মুহাম্মদ ইসহাক দেহলবী রহ.।

[২] কোনো হাদিসের সনদ, যা রাসুল সা. থেকে সমকালীন বুজুর্গ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চলে এসেছে। বরকতস্বরূপ মানুষ তার সনদ শুনতে চায়। (সু)

অবস্থায় এই জন্তুর সামনে আমার উলঙ্গ হওয়া কি বৈধ হবে?' ছোটভাই লিখে দিলেন, হ্যাঁ হবে। কিছুদিন পর বড়ভাই সুস্থ হয়ে এলেন। তাকে বিষয়টি জানানো হলে তিনি বললেন, 'আরে! তুমি তো ভুল উত্তর দিয়েছ। প্রশ্নকারী ব্যক্তি তার জন্তুকে উলঙ্গ দেখতে পারে; তবে সে উলঙ্গ হয়ে তার সামনে যেতে পারে না।'

কথার জের ধরে মৌলবী সাহেব আরেকটি গল্প শোনালেন। মুফতি ইউসুফ লখনবীর[১] কাছে কেউ ফতোয়া পাঠালেন। এক ব্যক্তি স্ত্রীর আপন বোনকে বিয়ে করেছে। সে ঘরে তার সন্তানও জন্মেছে। শরিয়াহ অনুযায়ী এই সন্তানের বংশ তো শুদ্ধ; কিন্তু এই সন্তান পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে কি না? তিনি উত্তর দিলেন, যেহেতু বংশ শুদ্ধ হয়েছে, তাই সম্পত্তিও সে পাবে। এই উত্তরপত্রটি মুফতি সদরুদ্দীন খান সাহেবের কাছে এলে আমি দেখতে পাই। আমি বলি, উত্তর ভুল হয়েছে। অশুদ্ধ বিয়ের ক্ষেত্রে বংশ প্রমাণিত হলেও সম্পত্তির অংশিদারত্ব সাব্যস্ত হয় না। মুফতি সাহেব আমার উত্তর শুনে খুব অবাক হলেন। আমি তাকে বললাম, দেখুন! পাঠদান ও ফতোয়াপ্রদান এক নয়; দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার বিচারে দুটি ভিন্ন জিনিস। প্রতিটি বিষয়ের জন্য প্রয়োজন ভিন্ন ভিন্ন দক্ষতার।

لِكُلِّ فَنٍّ رِجَالٌ[২]

কথার পিঠে কথা চলতে চলতে মাগরিবের সময় হয়ে আসে। সে মসজিদেই নামাজ আদায় করি। মসজিদের প্রায় সব মুসল্লি ছিল গাইরে মুকাল্লিদ। নামাজের পর হাত তুলে সম্মিলিত মুনাজাতের প্রচলন নেই এখানে। নামাজ শেষে স্বাভাবিকভাবেই সবাই বেরিয়ে এল। নজির সাহেব নামাজ শেষ করে ছেলের ঘরে গেলেন। হয়তো রাতের আহারপর্ব সেখানেই সারবেন। আমি একজন ছাত্রের থেকে দরসের সময়সূচি জেনে সরাইখানায় ফিরে এলাম।

[১] লক্ষ্ণৌর ফিরিঙ্গিমহলে নবাবদের আমলে মুফতি ছিলেন। এরপর জৌনপুর মাদরাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে নিয়োজিত হন। তিনি সমকালীন অন্যতম প্রসিদ্ধ আলেম। মাওলানা ফারুক চিড়য়াকোটি সাহেবের উসতাদ ছিলেন। ১২৮৬ খ্রিষ্টাব্দে মদিনায় ইনতেকাল করেন। (সু)

[২] প্রতিটি শাস্ত্রেই বিশেষজ্ঞ রয়েছে।

সাইয়েদ নজির হুসাইন দেহলবীর দরসে প্রথমদিন

১৬ রজব ১৩১২, সোমবার।

প্রত্যুষে প্রয়োজন সেরে ৮টার মধ্যেই উপস্থিত হলাম নজির হুসাইন সাহেবের মাদরাসায়। গিয়ে দেখি বুখারি শরিফের দরস হচ্ছে। খুব আগ্রহের সাথে গিয়ে বসলাম। টানা ১১টা পর্যন্ত বিভিন্ন কিতাবের দরস চলতে থাকল। আমি সবক'টি দরসে বসে রইলাম। দরসের ধরন শুরুতে স্বাভাবিক থাকলেও খানিকবাদে মৌলবী সাহেব কিছুটা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা শুরু করলেন। আমার ধারণা, দরসের নিমগ্নতায় শুরুতে মৌলবী সাহেব আমাকে দেখেননি। যখন দেখেছেন- তৎক্ষণাৎ আলোচনার ঢঙ বদলে দিয়েছেন। এটা নিছক আমার ধারণা।

ان بعض الظن اثم[১]

১১টার দিকে দরস শেষ হল। আমি দরস ছেড়ে উঠলাম। তিনিও সাথে সাথে বেরোলেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'দরসে এসেছিলেন কোন মতলবে?' বললাম, 'হজরত, আমি শুধুমাত্র শ্রবণের উদ্দেশ্যে এসেছি।' তিনি বললেন, 'মিয়া! আপনি শিক্ষিত যুবক, দেহে শক্তি আছে, কোথাও বসে পড়ানো শুরু করুন। আমরা তো বুড়ো হয়ে গেছি। সত্তর-বাহাত্তরে পা দিয়েছি। হুঁশজ্ঞান হারাতে বসেছি। আমাদের দরসে তেমন আর কী আছে! শরীরও আজকাল তেমন চলছে না। রোগ-বালায় জীর্ণ হয়ে গেছে।' উপযোগী শব্দে তার বিনয়মাখা কথামালার জবাব দিলাম। আমার আগ্রহ দেখে তিনি আরও ভোরে আসতে বললেন, যাতে সবক'টি দরসে অংশগ্রহণ করতে পারি। আমি সালামের মাধ্যমে বিদায় জানিয়ে ফিরে এলাম।

মৌলবী হাফিজুল্লাহ দেহলবীর বয়ানের মজলিস

মাদরাসা থেকে ফিরতি পথে মনে পড়ল, আজ সোমবার। এইদিন গাজিউদ্দীন খাঁর মসজিদে বয়ান হয়। সকাল থেকেই মাওলানা হাফিজুল্লাহ সাহেব বয়ান করে থাকেন। হাতে তেমন কাজবাজ নেই। সময় কাজে লাগাতে মসজিদে গিয়ে বসলাম। হাফিজুল্লাহ সাহেব সুরা ইউনুসের তাফসির করছিলেন। কী চমৎকার ছিল সে আলোচনা! মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত শুনলাম। বয়ান শেষ হলে সরাইখানায় ফিরে এলাম।

জোহরের নামাজ শেষে আবার গেলাম মাদরাসায়। তখন বুখারির দরস হচ্ছিল। *বুখারি* শেষ হলে *হিদায়ার* দরস হল। সকালের মতো কোনো তাত্ত্বিক আলোচনা নয়; স্বাভাবিক গতিতেই এগোচ্ছিল। যিনি পড়ছিলেন, অর্থও তেমন বলছিলেন না। কিছু কিছু

[১] মর্মার্থ- নিশ্চয় ক্ষেত্রবিশেষ ধারণা করা পাপ। (সুরা হুজুরাত, আয়াত ১২)